VERMI COMPOST

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্য ও সংকলন -
কারিগরী তথ্য - ডঃ অঞ্জলী শর্মা (বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান)
সম্পাদনা - ডঃ সুরজিৎ সরকার, বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান
উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
প্রকাশকাল - মার্চ, ২০২১

মূল্য - ৭৫/-

মাটির সুস্বাস্থ্যের জন্য সমৃদ্ধ কেঁচো সার

Enriched Vermicompost for better Soil health

আর্থিক সহযোগিতায় - ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদ, ARYA প্রকল্প

ডঃ অঞ্জলী শর্মা
উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর
Phone - 94770 13666 e-mail : udpkvk@gmail.com

ভূমিকা

ফসলের সঠিক চাষ পদ্ধতি বৃদ্ধি, এবং অধিক ফলনের জন্য সার একটি আবশ্যকীয় উপাদান। চাষবাসের নিবিড়তা যত বেড়ে চলেছে ততই মাটিতে উদ্ভিদ খাদ্য-উপাদানের মাটতি বেড়ে চলছে। এই মাটতি পূরণ করার জন্য সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। এই সার প্রয়োগ যতটা সম্ভব জৈব সারের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ রাসায়নিক সারের অধিক প্রয়োগের ফলে মাটির স্বাস্থ্য খারাপ হয়, নষ্ট হয় আমাদের চারপাশের পরিবেশ। জৈব সার ব্যবহারে মাটির গঠন উন্নত হয়, ভূমিক্ষয় কম হয়, মাটির ধর্মগুলির উন্নতি হয়। মাটির জীবন বা উর্বরতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জৈব সারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জৈবসারে গাছের খাদ্য-উপাদান ছাড়াও বহু পুষ্টিকারক পদার্থ থাকে, যারা গাছের বৃদ্ধিতে বা সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। চাষবাসের আদি যুগ থেকেই নানা রকম জৈবসার ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও বর্তমানে বিভিন্ন কারণে এর ব্যবহার কমেছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও জৈব সারের ভূমিকা রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জৈব সারের প্রস্তুতি এবং তার সঠিক প্রয়োগ। সবরকম পাঠকের কথা মাথায় রেখে সরল ভাষায় এই বইটি লেখা হয়েছে; এতে রয়েছে জৈবসার বিষয়ক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য। আনন্দ, জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা - সবকিছু পাওয়া যাবে এই বইটি থেকে। আশা রাখি, জীবনের পাঠ নেওয়া ও দেওয়ার কাজে বইটি সাহায্য করবে।

এই বই লেখার পেছনে আমরা অনেকটা ঋণী চাষীদের কাছে। যারা আমাদের লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এছাড়া (ICAR) ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ও ATARI, Kolkata ARYA প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছি। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আমার সহযোগীগণ আমাদের সাহায্য করেছেন। এছাড়া আর যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই।

ডঃ অঞ্জলী শর্মা

সূচীপত্র (Content)

১.১ কৃষি ব্যবস্থার মূল মন্ত্র। ৩
১.২ কেঁচো সার কী ? ৪
১.৩ জৈব সার হিসাবে সাধারণ গোবর সারের পরিবর্তে কোন কেঁচোসার ব্যবহার করবেন ? ৪-৫
১.৪ ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সারের গুরুত্ব। ৫-৬
১.৫ কেঁচোসার তৈরী করতে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয়? ৬-৮
১.৬ কোন কোন আবর্জনা থেকে কেঁচোসার তৈরি করা যায় ? ৮-৯
১.৭ সার ঘটিত বস্তু গুলির প্রাথমিক পরিচর্যা। ১০
১.৮ কেঁচো কিভাবে জৈব সার তৈরী করে ? ১০
১.৯ কেঁচো সার তৈরি করার বিভিন্ন পদ্ধতি। ১১
২.০ কিভাবে চৌবাচ্চায় কেঁচোর জন্য বিছানা তৈরি করবেন ? ১২
২.১ কিভাবে চৌবাচ্চা থেকে কেঁচোসার সংগ্রহ করবেন ? ১২
২.২ বিশেষ সতর্কতা। ১৩
২.৩ সার ধোয়া জলের গুরুত্ব। ১৩
২.৪ কেঁচো এবং গুটি পরিবহণ। ১৩
২.৫ কেঁচোসার কোথায় এবং কি পরিমাণে ব্যবহার করবেন ? ১৪
২.৬ ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরির পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি। ১৫
২.৭ ভার্মি কম্পোষ্ট এর প্রকারভেদ এবং অর্থনীতি। ১৫-২২
২.৭ (ক) ছোটো উদ্যোগ। ১৫-১৭
২.৭ (খ) মাঝারী উদ্যোগ। ১৭,১৮-১৯
২.৭ (গ) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বড়ো উদ্যোগ। ১৯-২২
৩.০ গুণগতমান বৃদ্ধি করা বা সমৃদ্ধশালী জৈবসার প্রযুক্তি ও ব্যবহার। ২৩-২৪
৩.১ জৈবসার ব্যবহারের কারণ। ২৩
৩.২ জৈব সারের উৎস। ২৩
৩.৩ প্রথাগত জৈব সারের ব্যবহারের অসুবিধা। ২৩
৩.৪ জীবাণু সার। ২৪
৩.৫ জীবাণু সার কী ? ২৪
৩.৬ জীবাণু সারের শ্রেণীবিভাগ। ২৪
৩.৭ নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুসার। ২৪
৩.৭ (ক) মিথোজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু। ২৪
৩.৭ (খ) মুক্তজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু। ২৫
৩.৮ জীবাণু সারের প্রয়োগ পদ্ধতি। ২৭
৩.৯ জীবাণু সার ব্যবহারের উপযোগিতা। ২৮
৪.০ জীবাণু সার প্রয়োগের সতর্কতা। ২৯
৪.১ ফসফেট -পটাশ দ্রবীভূতকারী জীবাণু সার। ২৯
৪.২ গুণগতমান বৃদ্ধি করা জৈব সার। ২৯
৪.৩ জৈব কৃষিতে জীবাণু সারের উপযোগিতা ও প্রয়োগবিধি। ৩০
৪.৪ জৈব কৃষিতে রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু সারের উপযোগিতা ও প্রয়োগবিধি। ৩১
৪.৫ রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণুর ব্যবহার দ্বারা রোগ ও জীবাণুর দমন। ৩২

মাটির সুস্বাস্থ্যের জন্য সমৃদ্ধ কেঁচো সার

(Enriched Vermicompost for better Soil health)

১.১ কৃষি ব্যবস্থার মূল মন্ত্র ঃ

জৈব কৃষি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল অসুস্থ মাটিকে সুস্থ করা এবং শস্যের সুরক্ষার সৈনিক, প্রকৃতির সেবক কোটি কোটি অনুজীবীদের ফিরিয়ে আনা। আমাদের সদা মনে রাখতে হবে মাটির স্বাস্থ্যের কথা। কৃষকের কাজ হবে মাটির চিন্তা করা, মাটি কৃষকের চিন্তা করবে। রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থায় আমরা শস্য উৎপাদনের সব স্থায়িত্ব মাটি থেকে কেড়ে নিয়েছি। নূতন ব্যবস্থায় সব দায়িত্ব মাটিকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। কৃষককে হতে হবে মাটিরই আজ্ঞাবহ সেবক। আমাদের বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় শস্য উৎপাদন অনেকটা ধাত্রী দ্বারা অসুস্থ মায়ের সন্তান পালনের মতোই কৃত্রিম ব্যবস্থা। বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় শস্য কৃষকের সন্তান, মাটির নয়। নূতন ব্যবস্থায় শস্য হবে মাটির সন্তান। তখন বসুন্ধরার দ্বারা শস্য পালন হবে সহজাত। সেই প্রয়াসে মমতা মাখানো থাকবে। তাই আমরা যদি নূতন কৃষি ব্যবস্থায় মাটিকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারিনী করতে পারি, বসুন্ধরা জন্ম দেবে স্বাস্থ্যবান ফসলের। তৈরী হবে আগেকার দিনের পুষ্টিভরা ফসল - অতি রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থায় যা আজ হারিয়ে গেছে। (Prof. Amulya Kumar Mitra)

বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশের মাটিতে জৈব বস্তুর পরিমাণ দ্রুত কমে যাচ্ছে। ফলে, একদিকে যেমন মাটির ভাঙন, জল ধারণ ক্ষমতা, অম্লত্ব-ক্ষারকের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে মাটিতে উপকারী জীবানুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যার ফলে পূর্ণমাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ ব্যবহারিক সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের দেশে জৈব সারের প্রধান উৎস হল গোবর। কিন্তু তার প্রায় ৭০ শতাংশ জ্বালানির কাজে খরচ হয়। বাকি গোবর থেকে যে গোবর সার তৈরী হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্ধ পচা এবং নিম্ন মানের। এছাড়া বাজারে জৈব সার বলে যা কিছু পাওয়া যায় তার দাম অনেক বেশী এবং সর্বক্ষেত্রে উচ্চমানের নয়। অথচ, বিভিন্ন প্রকার খামারজাত ও জৈব-আবর্জনা থেকে কেঁচো সার তৈরী করে জমিতে দিলে চাষের খরচ কম হয়, মাটির স্বাস্থ্য বজায় থাকে এবং শস্যের ফলনও বৃদ্ধি পায়।

১.২ কেঁচো সার কি ?

খামার জাত ও গৃহস্থ বাড়ীর ফেলে দেওয়া জৈব-আবর্জনা, অব্যহৃত শাক-সব্জি, ফল মূল, খোসা ইত্যাদির অংশবিশেষ কেঁচোর সাহায্যে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী জৈব সারে রূপান্তরিত হওয়াকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ভার্মিকম্পোষ্ট বা কেঁচো সার বলা হয়।

১.৩ জৈব সার হিসাবে সাধারণ গোবর সারের পরিবর্তে কেন কেচোঁসার ব্যবহার করবেন ?

চিরাচরিত পদ্ধতিতে তৈরী যে কোন কম্পোষ্ট সারের তুলনায় কেঁচো সার জলে দ্রবণীয় খাদ্যোপাদান বেশী যা গাছ মাটি থেকে সহজেই গ্রহণ করতে পারে। ৫ কেজি খামারজাত জৈব সার জমিতে দিলে এক মুঠি ইউরিয়া, ১ মুঠি ফসপেট এবং অর্ধেক মুঠি পটাশ সার দেওয়া হয়। পরিবর্তে সেখানে ৫ কেজি কেঁচো সার দিলে ২ মুঠি ইউরিয়া, ৯ মুঠি সুপার ফসপেট ও ১ মুঠি পটাশ সার দেওয়া হয়। এছাড়া, কেঁচো সারে অন্যান্য খাদ্যোপাদান যথা ক্যালসিয়াম এবং অনেকগুলি অনুখাদ্য (মাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, কপার, আয়রণ) সাধারণ গোবর সারের তুলনায় বেশী পরিমাণে থাকে।

কেঁচো সার এবং গোবর সারের তুলনার বিবরণ ঃ

ক্র.সঃ	বিবরণ	কেঁচো সার	গোবর সার
১	নাইট্রোজেন শতকরা	১.০০ - ১.৬০	০.৪০-০.৭৫
২	ফসফরাস শতকরা	০.৫০-৫.০৪	০.১৭-০.৩০
৩	পটাশ শতকরা	০.৪০-১.৫০	০.২০-০.৫৫
৪	ক্যালসিয়াম শতকরা	০.৪৪	০.৯১
৫	ম্যাগনেসিয়াম শতকরা	০.১৫	০.১৯
৬	লোহা (ppm)	১৭৫.২০	১৪৬.৫০
৭	ম্যাঙ্গানিজ (ppm)	৯৬.৫১	৬৯.০০
৮	জিঙ্ক (ppm)	২৪.৪৩	১৪.৫০
৯	কপার (ppm)	৪.৮৯	২.৪০
১০	কার্বন ঃ নাইট্রোজেন অনুপাত	১৫.৫০	৩১.২৮
১১	সার তৈরী করতে যে সময় লাগে	তিন মাস	বারো মাস
১২	পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধ	প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরী করে	প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরী করে

১.৪ ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচোসারের গুরুত্ব ঃ

ঘরোয়া, কৃষিজ ও অন্যান্য জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে মূল্যবাণ জৈব সার তৈরী করা যায়। এটি দূষণ কমাতে সাহায্য করে।

* রাসায়নিক সারের বদলে এই কেঁচো সার অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের হাত থেকে মুক্তি দেয়।

* খুব কম খরচে তৈরী করে সহজে ব্যবহার করা যায়।
* মাটিতে উপস্থিত উপকারী জীবানুগুলির কোন ক্ষতি করে না বরং তাদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
* মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় আবার ঝুরঝুরে করার ফলে অতিরিক্ত জল বার হতে সাহায্য করে।
* এতে উৎসেচক, হরমোন, ভিটামিন ইত্যাদি থাকে যার ফলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়; রোগ পোকার প্রতিরোদ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।
* মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারের মাত্রা (পি.এইচ) সঠিক রাখতে সাহায্য করে।
* ফসলের স্বাদ, গুণাগুণ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ফলে ফসলের দাম বেশী হয় ও চাষীর লাভ বাড়ে। কেঁচো সার প্রয়োগের ফলে পরিবেশ দূষণের ভয় থাকে না।
* সাধারণভাবে মাটিতে যে খাদ্যগুণ থাকে কেঁচোসার মেশানো মাটিতে তার দ্বিগুণ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম, প্রায় এগারো গুণ বেশি পটাশিয়াম ও আট গুণ বেশী উপকারী জীবানু থাকে।
* এই সার প্রয়োগের ফলে মাটির মধ্যস্থ গাছের খাদ্যপ্রাণ গাছের পক্ষে সহজলভ্য হয়।
* চিরস্থায়ী কম্পোষ্টিং পদ্ধতিতে মাঝেমাঝেই পচনশীল পদার্থগুলো উল্টে পাল্টে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয় যা খরচসাপেক্ষ, কিন্তু এই সারের ক্ষেত্রে এই কাজগুলি যেমন ঃ বায়ু চলাচল প্রক্রিয়া, পচনশীল পদার্থ গুলো উল্টে পাল্টে মিশিয়ে দেওয়ার কাজ কেঁচোই করে যা খরচ কমাতে সাহায্য করে।
* এই সার মাটির ভৌত, রসায়নিক ও জৈব চরিত্রের মানোন্নয়ন ঘটায়।
* বাড়তি কেচোঁ বিক্রি করে আয় করা যায়।
* বাড়তি কেঁচো মাছ, মুরগীর খাবার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

১.৫ কেঁচোসার তৈরী করতে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয়?

সারা পৃথবীতে প্রায় তিন হাজার ধরনের কেঁচো পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ প্রজাতিই কেঁচোসার তৈরী করতে পারে না বা কেঁচোসার তৈরির জন্য উপযোগী নয়।

ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য উপযোগী কয়েকটি প্রজাতি হল ঃ

আইসেনিয়া ফোয়েটিডা *(Eisenia foetida)*
লুম্ব্রিকাস রুবেলাস *(Lumbricus rubellus)*
ইউড্রিলাস ইউজেনি *(Eudrillus engeniae)*
ফেলেটিমা ইলিংগাটা *(Pheretima elongata)*
পেরিওনিক্স এক্সক্যাভোটাস *(perionix excavatas)*
এমেন্থিস ডিফরিজনস *(Amyanthes diffrigens)*

আমরা আইসেনিয়া ফোয়েটিডা প্রজাতির কেঁচো ব্যবহার করি। এই প্রজাতিটি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে এবং খুব অল্প সময়ে কেঁচোসার তৈরী করে।
আমাদের দেশে নিম্নলিখিত প্রজাতি দুটি উপযুক্ত ঃ
আইসেনিয়া ফোয়েটিডা *(Eisenia foetida)*
ইউড্রিলাস ইউজেনি *(Eudrillus engeniae)*

আইসেনিয়া ফোয়েটিডা *(Eisenia foetida)* ঃ

এটি এসেছে জার্মানী থেকে। সম্ভবত, সারা বিশ্বে এই প্রজাতির কেঁচোটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন নামে এটি বাজারে বিক্রি হয়। লাল কেঁচো, পটল কেঁচো, বেগুনি কেঁচো, বাঘা কেঁচো।
জীবিত কেঁচো নানা রঙের যথা ঃ লাল, তামাটে, বেগুনি, কৃষ্ণবর্ণ এই কেঁচো বিভিন্ন তাপমাত্রা ও আদ্রতায় বেঁচে থাকতে পারে, এরা দ্রুত বাড়ে। গড় আয়ু ৭০ দিন।

ইউড্রিলাস ইউজেনি *(Eudrillus engeniae)* ঃ

মূলত নিরক্ষয় পশ্চিম আফ্রিকার কেঁচো এটি। দক্ষিণ ভারতের ত্রাভনকোর, পুনে ও উত্তর কোনকানে পাওয়া যায়। ৪৭ দিনের মাথায় গুটি প্রসব করে। ১-৩ বছর বাঁচতে পারে।

এখানে তিন প্রজাতির কেঁচোর মধ্যে গুণগত তুলনা করা হল ঃ

আইসেনিয়া ফোয়েটিডা	ইউড্রিলাস ইউজেনি	পেরিওনিক্স এক্সক্যাভেটাস
আদি নিবাস - জার্মানি	আদি নিবাস - নিরক্ষয় পশ্চিম আফ্রিকায়	আদি নিবাস - অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড
সারাবিশ্বে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত	আমেরিকায় নাইটক্রুলার নামে পরিচিত	ভাণতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।
আমাদের দেশে সর্বত্রই পাওয়া যায়	দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।	-------
শহরের বর্জ্য পদার্থকে সারে পরিণত করতে খুব পারে	বর্জ্য পদার্থকে সারে পরিণত করতে খুব পারে।	বর্জ্য পদার্থকে সারে পরিণত করতে খুব পারে।
বাজারে লালকেঁচো, পটল কেঁচো, বেগুণী কেঁচো, ব্র্যান্ডিং ওয়ার্ম বিভিন্ন নামে এটি বিক্রি হয়।	জীবিত কেঁচো লাল ও জড় বেগুনী, তামাটে বর্ণের।	পিঠের উপরে সামনের অংশের রং ঘন বেগুনি থেকে লালচে বাদামি এবং নিচের অংশে হালকা রঙের।
জীবন্ত অবস্থায় লালচে বাদামী রঙের হয়	দৈর্ঘ্য = ৩২-১৪০ মি.মি.	দৈর্ঘ্য = ৩২-১৪০ মি.মি.
বৃদ্ধি দ্রুত	বৃদ্ধি দ্রুত	বৃদ্ধি দ্রুত
প্রতিদিন কেঁচো প্রায় ৭মি গ্রাম জৈব বস্তু রূপান্তরে সক্ষম।	অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক এবং তা থেকে সার উৎপাদন দ্রুত (১২মি. গ্রাম / কেঁচো)।	-----
জীবনকাল ঃ ৭০ দিন	জীবনকাল ঃ ১-৩ বছর বাঁচে	জীবনকাল ঃ ৪৬ দিন
প্রজননে সক্ষম ঃ ৫০-৫৫ দিনে	প্রজননে সক্ষম ঃ ৪০ দিনে	প্রজননে সক্ষম ঃ ২১-২২ দিন
ওজন ঃ ১.৫ গ্রাম	ওজন ঃ ৪.৩ গ্রাম	ওজন ঃ ৩.৫ গ্রাম

১.৬ কোন কোন আবর্জনা থেকে কেঁচো সার তৈরী করা যায় ?

সাধারণভাবে যে কোন ধরনের বাড়ী এবং খামারজাত ফেলে দেওয়া ও অব্যবহৃত জৈব আবর্জনা জাতীয় জিনিস থেকেই কেঁচোসার তৈরী করা যায়। তবে সারের গুণগত মান নির্ভর করে জৈব বস্তুর গুণগত মানের উপর।

কেঁচোসার তৈরীর উপযোগী বস্তু ও তার গুণগতমানের সারনী-১ এ দেওয়া হল।

জৈব আবর্জনা	উপযোগিতা
ধঞ্চে পাতা সুবাবুল গাছের পাতা, শিম্ব গোত্রীয় গাছের পাতা, ডাল জাতীয় শষ্যের অব্যবহৃত অংশ, সজনে পাতা, কচুরিপনা, টোপা পানা, মুগা ও রেশমকীটের প্রধান খাদ্য সোম ও সোয়ালু গাছের কচি ডগা ও পাতা এবং তুঁত গাছের পাতা ইত্যাদি।	উত্তম উপযোগী
মাশরুম চাষের পর পরিতক্ত খড়, অ্যাজোলা (এক ধরনের নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ পানা)	উত্তম উপযোগী
হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগলের মল, রান্নাঘরের ফল ও সব্জির ফেলে দেওয়া অংশ, ডিমের খোসা, পাটপাতা, বিভিন্ন প্রকার ঘাস, গাছের পাতা, কলাগাছ ইত্যাদি।	মধ্যম উপযোগী
ধান, গম, ভুট্টার খড়, আখের ছিবড়ে, ধানের তুষ ইত্যাদি	কম উপযোগী
কাঠের গুঁড়ো, নারকেলের ছিবড়ে, ধানের তুষ ইত্যাদি	কম উপযোগী
রসুন, পেঁয়াজ, আদা, লঙ্কা ইত্যাদি মশলা জাতীয় ফসলের অব্যবহৃত অংশ, উগ্র গন্ধ যুক্ত বা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, পার্থেনিয়াম, বেড়াকলমি, নিম প্রভৃতি গাছের অংশ বিশেষ।	ব্যবহার করা ক্ষতিকর

১.৭ সার ঘটিত বস্তুগুলির প্রাথমিক পরিচর্যা ঃ

যে বস্তুগুলি পচাতে হবে সেগুলি শোধনের জন্য প্রাথমিক পরিচর্যা জরুরী, এই ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গুলি নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল ঃ

* সঠিকভাবে আবর্জনাগুলি পরিষ্কার করা যেমন প্লাস্টিক, পাথর, কাঁচ, পোড়া মাটির টুকরো ইত্যাদি মুক্ত করতে হবে। কোন রাসায়নিক বস্তু থাকলে কেঁচো মারা যাবে।
* বড় চাঁই হওয়া আবর্জনা ভেঙ্গে দিতে হবে।
* আলাদা করা আবর্জনাকে ১ ফুট স্তর করে ভাল করে রোদ খাওয়াতে হবে।

* পচা পাতা শোধন ঃ শোধন সহজে করা যেতে পারে, তাতে সূর্যালোক পড়ে এবং ঐ স্তুপে লাঠি দিয়ে বারে বারে আঘাত করে ছোট টুকরো করে নিতে হবে। গাছপালা বা গাছের ছাল ও অবশিষ্টাংশ ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে।
* অনেক সময় রোগপোকা জনিত আবর্জনা থাকে। সেগুলি কেঁচোর খাদ্য প্রক্রিয়াকে বিঘ্নত করে। এই অবস্থায় আবর্জনাগুলিকে ছোট ছোট টুকরো করে ৪% নিমের জলীয় দ্রবণ ছিঁটিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিমের জলীয় দ্রবণ তৈরী করতে গেলে বীজগুলিকে প্রথমে শুকনো করে পরে শক্ত আবরণ দূর করে বীজগুলিকে কাপড়ে এক রাত্রি রেখে পরের দিন ১/২ লিটার জলে ডুবিয়ে নিঙড়ে নিতে হবে যা কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১.৮ কেঁচো কিভাবে জৈব সার তৈরী করে ?

* কেঁচো যে জৈব পদার্থ খায় তা পাকস্থলীতে ভেঙ্গে যায় এবং পরে আন্ত্রে গিয়ে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে জারিত হয়।
* এক কেজি কেঁচো গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২০-২৫ কেজি কেঁচো সার তৈরী করতে পারে।
* কেঁচো গৃহীত খাবারের ১০ শতাংশ দিয়ে নিজেদের শরীরের চাহিদা মেটায় এবং বাকী ৯০ শতাংশ বর্জ্য পদার্থ হিসাবে ত্যাগ করে। এই বর্জ্য পদার্থই হলো কেঁচোসার।

১.৯ কেঁচোসার তৈরি করার বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

গর্ত করে (Pit Method) বা কোন বড় পাত্রের মধ্যে (Container Method) যেমন ভার্মিকম্পোষ্ট করা যায় তেমনি মাটির উপর জড়ো করেও (Heap or Bed Method) করা যায়।

উত্তরবঙ্গের পরিবেশ অনুযায়ী গর্ত করে (Pit Method) কেঁচো সার উৎপাদন করা উপযুক্ত নয় কারণ এখানে প্রচুর মাত্রায় বৃষ্টি হয় এবং কেঁচো সার উৎপাদন গর্ততে জল জমার ভয় থাকে।

বড়ো পাত্রে কেঁচো সার কিভাবে তৈরী করবেন ?

* প্রথমবার তৈরীর ক্ষেত্রে মাটির পাত্র, সিমেন্টের পাত্র বা কাঠের পাত্র ইত্যাদি ছোট জায়গা নির্বাচন করা ভালো। সব কিছু ভালোভাবে জানার পর পাকা চৌবাচ্চাতে বড় আকারে করা যেতে পারে।
* প্রথমে বাতাস চলাচল করে এমন ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গা (যেখানে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায় না) বাছতে হবে।

* যাতে সরাসরি সূর্যের আলো এবং বৃষ্টির জল পাত্রে না ঢোকে তার জন্য ছাউনি যুক্ত জায়গায় পাত্রটিকে রাখতে হবে। পাত্রটিকে মাটি থেকে এক থেকে দেড় ফুট পাটাতনের উপর রাখতে হবে এবং এর তলাটি অবশ্যই সামান্য ঢালযুক্ত।
* পাত্রটিকে মাটি থেকে দেড় ফুট পাটাতনের উপর রাখতে হবে এবং এর তলাটি অবশ্যই সামান্য ঢালযুক্ত হবে।

পাত্রের তলদেশে ফুটো করতে হবে যাতে পাত্রের মধ্যে জল না দাঁড়ায়। একটি মাটির হাঁড়িতে ৫০০ কেঁচো ছাড়লে ১০০ কেজি আবর্জনা থেকে ৫০-৮০ দিনের মধ্যে ২৫-৩০ কেজি কেঁচো সার পাওয়া সম্ভব।

চৌবাচ্চা বা Chamber মাটির উপর পাকা চৌবাচ্চা তৈরি করে কেঁচো সার তৈরী (Chamber method) ঃ

খরচ কমানোর জন্য সিমেন্ট ঢালাই করে চৌবাচ্চা তৈরী করা যায়। এই পদ্ধতিতে অনেকগুলি সুবিধা আছে।

ইঁট এবং সিমেন্ট দিয়ে টাঙ্ক তৈরী করা যায় । জল নির্গনের জন্য একটি বহিঃমুখি নালা দেওয়া হয়; চৌবাচ্চার আকার সাধারণত ঃ ৬ ফুট x ৩ ফুট x ১.৫ ফুট হয়।
* খুব কম খরচের মধ্যে মাটির বা বাঁশের বেড়া দিয়ে চৌবাচ্চা তৈরি করা যেতে পারে।

* দলের মহিলারা নিজেদের বাড়িতে ২ ফুট ২ ফুট গর্ত করে আবর্জনা পঁচিয়ে নিতে পারে এবং এক জায়গায় সংগ্রহ করে কিছু কেঁচো ছেড়ে দিতে পারে এবং দলগতভাবে কেঁচো সার তৈরি করে নিতে পারে।

২.০ কিভাবে চৌবাচ্চায় কেঁচোর জন্য বিছানা তৈরী করবেন ?

* প্রথমে চৌবাচ্চার তলদেশে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ ইঁটের টুকরো, ছোট পাথর, হাঁড়ি ভাঙ্গা ইত্যাদি দিতে হবে।
* তার উপর মোটা বালি ১ ইঞ্চি পরিমাণ সমান করে বিছিয়ে দিতে হবে।
* চৌবাচ্চার মধ্যে সরাসরি কাঁচা আবর্জনা না দেওয়াই ভালো।
* সবুজ পাতা সবুজ ঘাস ইত্যাদির ব্যবহার করলে আলাদা করে একটি জায়গায় ১০ শতাংশ গোবর জলে ভিজিয়ে একমুঠো ইউরিয়া মাখিয়ে ১৫-২০ দিন পচিয়ে নিয়ে কেঁচোর চৌবাচ্চায় ব্যবহার করতে হবে।
* কেঁচোর বিছানায় কেঁচো ছাড়ার ৭ দিন পর থেকে প্রতি ৩ দিনে ২ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করে আবর্জনা কেঁচোর খাবার হিসাবে দিতে হবে। এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ আবর্জনা না দেওয়াই ভাল।
* গরু, ছাগল, মুরগী, রেশম পোকা ইত্যাদির মল কেঁচোর খাবার হিসাবে ব্যবহার করলে তা একমাস মত অন্য একটি গর্তে পচিয়ে কেঁচোর চৌবাচ্চায় স্তরে স্তরে দেওয়া উচিত।
* খাবার দেবার পর থেকে প্রতিদিন উপরের খড় ও চট সরিয়ে অল্প অল্প করে জল ছিটিয়ে দেওয়া উচিৎ। দেখতে হবে যেন অতিরিক্ত জল চৌবাচ্চার তলায় না দাঁড়ায়, আবার জলের অভাবে কেঁচোর খাবার একেবারে শুকনো হয়ে না যায়।

২.১ কিভাবে চৌবাচ্চা থেকে কেঁচো সার সংগ্রহ করবেন ?

* চৌবাচ্চার চট সরিয়ে যদি দেখা যায় জৈব বস্তু কালো রংয়ের খন্ডাকৃতি গোল গোল দানায় পরিণত হয়েছে তবে বুঝতে হবে সার তৈরী হয়ে গেছে।
* এর পর ৩ দিন জল দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে, এতে কেঁচো চৌবাচ্চার নীচের দিকে চলে যাবে। এরপর উপরের দিক থেকে সার সংগ্রহ করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে হবে যাতে ৭-৮ দিনের মধ্যে সারের মধ্যে উপস্থিত গুটি (Cocoon) থেকে কেঁচো বেরিয়ে আসতে পারে। এই রকম ভাবে করলে কেঁচোর সংখ্যা কম হবে না।
* তারপর মিহি ছিদ্র যুক্ত চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। চালুনির উপরে যে কেঁচো ও কেঁচোর ডিম থাকবে সেগুলি আবার চৌবাচ্চায় ছাড়তে হবে।

২.২ কিছু বিশেষ সতর্কতা ঃ

* পিঁপড়ে কেঁচোর অন্যতম প্রধান শত্রু। এর হাত থেকে রক্ষা করতে সাদা চকের মত লক্ষণ রেখা দিয়ে চৌবাচ্চার চারিদিকে দাগ দিতে হবে।
* কোনভাবেই চৌবাচ্চায় কোনরকম রাসায়নিক সার বা ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না।
* কেঁচো সারের চৌবাচ্চার মধ্যে সব সময়ে ৬০-৬৫ শতাংশ আদ্রতা থাকতে হবে।
* ছুঁচো এবং পাখির হাত থেকে কেঁচোকে বাঁচাতে চৌবাচ্চা তারজালি বা মশারির নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
* কাঠ বা বাঁশের চালাঘর ঘুন বা উইপোকা আটকাতে কাঠ বা বাঁশে আলকাতরা / পোড়া মোবিল বা ডিজেল দিয়ে রঙ হবে।
* উগ্র গন্ধ যুক্ত ফসল (আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি) বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, পার্থেনিয়াম বেড়াকলমি, লেবু, কাঁচা নিম ইত্যাদি কেঁচোর পক্ষে ক্ষতিকারক।
* কেঁচো সার তৈরি করার সময় চৌবাচ্চাতে শক্ত কোন লাঠি, বাঁশ বা শক্ত কোন কিছু দিয়ে খোঁচানো যাবে না তাহলে কেঁচোর ক্ষতি হবে। এই ক্ষেত্রে পাজ্ঞা নামক কৃষি যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

২.৩ সার ধোয়া জলের গুরুত্ব ঃ

সার ছাড়াও এই পদ্ধতিতে যে সার ধোওয়া জল পচনের শেষ পর্যায়ে তৈরী হয়। তা লোহার ড্রামে বা প্লাস্টিক বা সিমেন্টের চারি ইত্যাদি পাত্রে রেখে পরবর্তীকালে জল মিশিয়ে পাঁচগুণ পাতলা করে জমিতে সার হিসাবে কিংবা কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.৪ কেঁচো এবং গুটি পরিবহণ ঃ

১। পরিস্কার প্লাস্টিকের কৌটো নিন। এর ঢাকনাতে অনেক ছিদ্র থাকবে। চাষিরা প্লাস্টিকের কৌটোর পরিবর্তে মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করতে পারে তাহলে তাপমাত্রা ঠিক থাকে এবং কেঁচো মরে যাওয়ার ভয় কম থাকে।
২। কৌটোয় কেঁচোর খাদ্যদ্রব্য নিন।
৩। কৌটোয় জীবিত কেঁচো রাখুন। প্রতি কেঁচোর জন্য ১.৫ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন। কেঁচো প্রতি ০.৫ বর্গ ইঞ্চি জায়গা দরকার। ১ লিটারের কৌটোয় ২০০-৫০০ কেঁচো ২৪ ঘন্টা রাখা যায়।

গুটির মোড়কবন্দি ও পরিবহণ ঃ

১। পরিস্কার প্লাস্টিকের কৌটো নিন। এর ঢাকনাতে অনেক ছিদ্র থাকবে।
২। কৌটোয় গুটির খাদ্যদ্রব্য নিন। গুটির প্রতি ০.৫ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন।

২.৫ কেঁচো সার কোথায় এবং কি পরিমাণ ব্যবহার করবেন ?

কেঁচো সার গোবর সারের মতো ফসল লাগানোর আগে প্রথম চাষের আগেই ছড়িয়ে দিয়ে লাঙ্গল দিতে হবে এবং সাধারণভাবে যেখানে গোবর সার ব্যবহার করা হয় তার পরিবর্তে কেঁচো সার একের তিনভাগ হারে দিলেই হবে। কেঁচো সার খামারে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মাটির মধ্যে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রখর রোদে কখনো জমিতে কেঁচো সার দেওয়া উচিত নয়।

ফসলের বিভিন্নতা অনুযায়ী কেঁচোসার ব্যবহারের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রম.সং	ফসলের নাম	মাত্রা
১	আঁখ	৫.০০ টন / হেক্টর
২	কাপাস	৩.৭৫ টন / হেক্টর
৩	চাল, গম, বাজরা, ভুট্টা	২.৫০ টন / হেক্টর
৪	চিনাবাদাম, অরহর, মাসকলাই, মুগ	২.৫০ টন / হেক্টর
৫	আলু, টমাটর, বেগুন, গাজর, ফুলকপি, পেঁয়াজ, রসুন	১.৮৭ টন / হেক্টর
৬	গুলাব, চামেলি, গেঁদা ইত্যাদি	৩.৭৫ টন / হেক্টর
৭	লঙ্কা, আদা, হলদি	৩.৭৫ টন / হেক্টর
৮	আঙ্গুর, আনারস, কলা	৩.৭৫-৫.০০ টন / হেক্টর
৯	নারকেল, আম	৪-৫ কিলোগ্রাম প্রতি গাছে (৫ বৎসর থেকে কম) ৮-১০ কিলোগ্রাম প্রতি গাছে (৫ বৎসর থেকে বেশী)
১০	লেবু, কমলা লেবু, মুসম্বি, ডালিম	৩-৪ কিলোগ্রাম প্রতি গাছে (৫ বৎসর থেকে কম) ৬-৮ কিলোগ্রাম প্রতি গাছে (৫ বৎসর থেকে বেশী)
১১	টবে লাগানো গাছ	২৫০ গ্রাম প্রতি গামলা

২.৬ ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিঃ

ধাপ ১ঃ ঠান্ডা এবং ছায়াযুক্ত জায়গায় নির্বাচন।

ধাপ ২ঃ গোবর এবং কৃষিজ বর্জ্য ১০:০৩ অনুপাতে মিশিয়ে আংশিক পচনশীল করার জন্য ১৫-২০ দিন রেখে দিতে হবে।

ধাপ ৩ঃ বালি এবং খড় দিয়ে ১৫-২০ সেন্টিমিটার পুর আস্তরণ তৈরি করতে হবে।

ধাপ ৪ঃ এর উপরে আংশিক ভাবে পৌঁছে যাওয়া গোবর ও কৃষি বর্জ্য পদার্থের আস্তরণ ৬× ৩ ×১.৫ আকার করতে হবে।

ধাপ ৫ঃ পচা পাতার আস্তরনের উপর কেঁচো ছাড়তে হবে।

ধাপ ৬ঃ ধারাবাহিকভাবে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রের উপর জল দিতে হবে।

ধাপ ৭ঃ পাটের পুরানো বস্তা বা চট দিয়ে ভার্মি কম্পোস্ট ক্ষেত্র ঢেকে দিতে হবে।

ধাপ ৮ঃ ১৫-২০ দিন পর ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি হতে শুরু হয়।

ধাপ ৯ঃ ৪৫-৫০দিন পর ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে যায়।

ধাপ ১০ ঃ তারপর ভার্মি কম্পোস্টের পৃথকীকরণ করতে হবে।

ধাপ ১১ ঃ ভার্মি কম্পোস্টকে ঢালতে হবে।

ধাপ ১২ঃ অবশেষে ভার্মি কম্পোস্টকে বস্তাতে ভরে ব্যবহারের জন্য তৈরি করতে হবে।

২.৭ ভার্মিকম্পোষ্ট এর প্রকারভেদ এবং অর্থনীতি

২.৭ (ক) ছোট উদ্যোগ ঃ

ছোট উদ্যোগে ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরী বলতে আমরা বুঝি যে সব চাষীর ০.৫-২.০ হেক্টর জমি আছে এবং বছরে ৩-১০ টন ভার্মিকম্পোষ্টের প্রয়োজন হয়। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত ভার্মিকম্পোষ্ট নার্সারী, বাগান ও কৃষকদের বিক্রি করা যায়। ছোট উদ্যোগে বছরে ১০ টন উৎপাদনে সক্ষম ভার্মিকম্পোষ্ট ক্ষেত্র তৈরী করতে ১০ মিটার ১০ মিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। বছরে ১০ টন ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরীর জন্য বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক খরচের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ -

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তৈরীর খরচ (প্রথম পর্যায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	খরচ
১	ভার্মিকম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য ঘর ৫ মিটার বাই ১০ মিটার (অস্থায়ীভাবে তৈরী বাঁশ এবং খড় দিয়ে তৈরী)	৬০০০.০০
২	চারদিকের বেড়া - বাঁশের পাতলা আঁশ দিয়ে তৈরী	১০০০.০০
৩	গোবর এবং কৃষিজ বর্জ্য ৪ টন @ ১০০০ টাকা / টন	৪০০০.০০
৪	কেঁচো ১০ কেজি @ ৬০০ টাকা / কেজি	৬০০০.০০
৫	একজন শ্রমিক @ ২৫০ টাকা / প্রতিদিন - ২ মাসের জন্য	১৫০০০.০০
৬	অন্যান্য জিনিস যেমন - (কোদাল, চালনী, জলের ঝর্ণা তৈরীর যন্ত্র)	২০০০.০০
৭	প্রয়োজনীয় জলের খরচ	২০০০.০০
৮	পরিবহণ খরচ এবং প্যাকেজিং	১০০০.০০
	মোট	**৩৫০০০.০০**

প্রথম পর্যায়ের পর ভার্মিকম্পোষ্ট থেকে আয় (তিন মাসের পর)

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়
১	কেচোঁ ১০ কেজি / ৬০০ টাকা / কেজি	৬০০০.০০
২	ভার্মিকম্পোষ্ট সার ৩.০ টন @ ১০০০০ টাকা / টন	৩০০০০.০০
	মোট আয়	**৩৬০০০.০০**

লাভ = মোট আয় - মোট খরচ ৩৬০০০.০০ - ৩৫০০০.০০

= ১০০০.০০ টাকা

* প্রতিটি পর্যায়ক্রমে ৩.০ টন করে চারটি পর্যায়ক্রমে মোট ১০ টন ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরী হবে

* প্রতিটি পর্যায়ক্রমে ২০ কেজি কেঁচো তৈরী হবে যা থেকে ১০ কেজি রেখে দেওয়া হবে এবং অতিরিক্ত ১০ কেজি বিক্রি করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং খরচের হিসাব

ক্রমিক নং	বিবরণ	খরচ
১	ভার্মিকম্পোষ্ট ঘরের রক্ষণাবেক্ষনের খরচ	১০০০.০০
২	গোবর এবং কৃষিজ বর্জ্য ৪ টন @ ১০০০ টাকা / টন	৪০০০.০০
৩	১ জন শ্রমিক @ ২০০ টাকা / প্রতিদিন ২ মাসের জন্য	১২০০০.০০
৪	জলের খরচ	২০০.০০
৫	প্যাকেজিং এবং পরিবহনের খরচ	১০০০.০০
	মোট খরচ	**১৮২০০.০০**

দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর আয়ের হিসাবে

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়
১	কেচো ১০ কেজি / ৬০০ টাকা / কেজি	৬০০০.০০
২	ভার্মিকম্পোষ্ট ২.৫ টন @ ১০০০০/ টন	২৫০০০.০০
	মোট আয়	**৩১০০০.০০**

লাভ = মোট আয় - মোট খরচ ৩১০০০ - ১৮২০০.০০

= ১২৮০০.০০ টাকা অর্থাৎ ৪২৬৬.০০ টাকা প্রতি মাস

২.৭ (খ) মাঝারী উদ্যোগ ঃ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষক যাদের ২.০-৪.০ হেক্টর জমি আছে এবং বছরে ১০-২০ টনের মত ভার্মিকম্পোষ্ট এর দরকার তাদের জন্য মাঝারি মানের ভার্মিকম্পোষ্ট ক্ষেত্র প্রযোজ্য। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে তারা অতিরিক্ত ভার্মিকম্পোষ্ট নার্সারি, বাগান কিংবা অন্য চাষীদের কাছে বিক্রি করতে পারেন। বছরে ২০ টন ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ও অর্থনীতি নিচে দেওয়া হল -

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তৈরীর খরচ (প্রথম পর্যায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	খরচ
১	ভার্মিকম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য ঘর ৫ মিটার বাই ১০ মিটার (অস্থায়ীভাবে তৈরী বাঁশ এবং গ্লাস দিয়ে তৈরী)	৫০০০.০০
২	চারদিকের বেড়া - বাঁশের পাতলা আঁশ দিয়ে তৈরী	২০০০.০০
৩	গোবর এবং কৃষিজ বর্জ্য ৮ টন @ ১০০০ টাকা / টন	৮০০০.০০
৪	কেঁচো ২০ কেজি @ ৫০০ টাকা / কেজি	৮০০০.০০
৫	দুইজন শ্রমিক @ ৩০০ টাকা / ২ মাসের জন্য	১৮০০০.০০
৬	অন্যান্য জিনিস যেমন - (কোদাল, চালনী, জলের ঝর্ণা তৈরীর যন্ত্র)	৩০০০.০০
৭	প্রয়োজনীয় জলের খরচ	৪০০.০০
৮	প্যাকেজিং এবং পরিবহণ খরচ @ ৪০০ টাকা / টন	২০০০.০০
	মোট	৪৬৪০০.০০

প্রথম পর্যায়ের পর ভার্মিকম্পোষ্ট থেকে আয় (তিন মাসের পর)

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়
১	কেঁচো২০ কেজি / ৬০০ টাকা / কেজি	১২০০০.০০
২	ভার্মিকম্পোষ্ট সার ৫ টন @ ১০০০০ টাকা / টন	৫০০০০.০০
	মোট আয়	৬২০০০.০০

লাভ = মোট আয় - মোট খরচ ৬২০০০.০০ - ৪৬৪০০.০০
= ১৫৬০০.০০ টাকা অর্থাৎ ৫২০০ টাকা প্রতি মাসে।

* প্রতিটি পর্যায়ক্রমে ৫ টন করে চারটি পর্যায়ক্রমে মোট ২০ টন ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরী হবে।
* প্রতিটি পর্যায়ক্রমে ৪০ কেজি কেঁচো তৈরী হবে যা থেকে ২০ কেজি রেখে দেওয়া হবে এবং অতিরিক্ত ২০ কেজি বিক্রি করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং খরচের হিসাব

ক্রমিক নং	বিবরণ	খরচ
১	ভার্মিকম্পোষ্ট ঘরের রক্ষণাবেক্ষনের খরচ	১০০০.০০
২	গোবর এবং কৃষিজ বর্জ্য ৮ টন @ ১০০০ টাকা / টন	৮০০০.০০
৩	২ জন শ্রমিক @ ২০০ টাকা / ২ মাসের জন্য	২৪০০০.০০
৪	জলের খরচ	৪০০.০০
৫	প্যাকেজিং এবং পরিবহনের খরচ	২০০০.০০
	মোট খরচ	৩৫৪০০.০০

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়
১	কেঁচো ১০ কেজি / ৩০০ টাকা / কেজি	৩০০০.০০
২	ভার্মিকম্পোষ্ট সার ২.৫ টন @ ৮০০ টাকা / টন	২০০০০.০০
	মোট আয়	২৩০০০.০০

দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর আয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়
১	কেঁচো ২০ কেজি @ ৬০০ / কেজি	১২০০০.০০
২	ভার্মিকম্পোষ্ট সার ৫ টন @ ১০০০ / টন	৫০০০০.০০
	মোট আয়	৬২০০০.০০

লাভ = মোট আয় - মোট খরচ ৬২০০০.০০ - ৩৫৪০০.০০
= ২৬৬০০.০০ টাকা অর্থাৎ ৮৮৬৬.০০ টাকা প্রতি মাস।

২.৭ (গ) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বড় উদ্যোগ ঃ

ভার্মিকম্পোষ্টের বড় উদ্যোগ বলতে ব্যবসায়িক ভিত্তিক পরিকল্পনাকে বোঝায়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করার জন্য বাজারের চাহিদা এবং কাঁচামালের যোগান যদি ৫০ টনের বেশি পরিমাণে সহজলভ্য হয় তাহলে ভাল। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষের মূল লক্ষ্য হল, নার্সারি, বাগান এবং চাষিদের নিকট প্রয়োজনীয় পরিমাণে উপলব্ধ করানো।

অর্থনৈতিক এবং লাভের অঙ্ক কাঁচামালের দাম উৎপন্ন ভার্মিকম্পোষ্ট এর পরিমাণ এবং বাজারের দামের উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বড় ইউনিট তৈরী করার আগে কাঁচামালের সহজলভ্যতা, অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান, জায়গা নির্বাচন, উৎপন্ন সারের পরিবহনের খরচ এবং বাজারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা খুবই দরকার। এতে ব্যবসার ক্ষতির সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। সাথে সাথে ব্যবসাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যদি কিছু পরিবর্তন বা সিদ্ধান্ত বদলের প্রয়োজন হয় তা ও করা যাবে।

বছরে ৫০টন ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ এবং আর্থিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল -

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তৈরীর খরচ (প্রথম পর্যায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	খরচ
১	ভার্মিকম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য ঘর ২৫ মিটার বাই ১০ মিটার (অস্থায়ীভাবে তৈরী অ্যাসবেস্টর এবং সিমেন্ট খুঁটি দিয়ে তৈরী)	২৫০০০.০০
২	চারদিকের বেড়া - ইঁট দিয়ে তৈরী	১০০০০.০০
৩	গোবর এবং কৃষিজ বর্জ্য ২০ টন @ ১০০০ টাকা / টন	২০০০০.০০
৪	কেঁচো ৫০ কেজি @ ৫০০ টাকা / কেজি	২৫০০০.০০
৫	৩ জন শ্রমিক @ ২৫০ টাকা / ২ মাসের জন্য	৪৫০০০.০০
৬	অন্যান্য জিনিস যেমন - (কোদাল, চালনী, জলের ঝর্ণা তৈরীর যন্ত্র)	৫০০০.০০
৭	প্রয়োজনীয় জলের খরচ	
৮	প্যাকেজিং এবং পরিবহণ খরচ @ ৪০০ টাকা / টন	১০০০.০০
	মোট	৫০০০.০০
		১৩৬০০০.০০

প্রথম পর্যায়ের পর ভার্মিকম্পোষ্ট থেকে আয় (তিন মাসের পর)

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়
১	কেঁচু ৫০ কেজি / ৬০০ টাকা / কেজি	৩০০০০.০০
২	ভার্মিকম্পোষ্ট সার ১২.৫ টন @ ১০০০০ টাকা / টন	১২৫০০০.০০
	মোট আয়	১৫৫০০০.০০

লাভ = মোট আয় - মোট খরচ ১৫৫০০০.০০ - ১৩৬০০০.০০
= ১৯০০০.০০ টাকা অর্থাৎ ৬৩০০.০০ টাকা প্রতি মাসে।

* প্রতিটি পর্যায়ক্রমে ২.৫ টন করে চারটি পর্যায়ক্রমে মোট ৫০ টন ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরী হবে।

* প্রতিটি পর্যায়ক্রমে ১০ কেজি কেঁচো তৈরী হবে যা থেকে ৫০ কেজি রেখে দেওয়া হবে এবং অতিরিক্ত ৫০ কেজি বিক্রি করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং খরচের হিসাব

ক্রমিক নং	বিবরণ	খরচ
১	ভার্মিকম্পোষ্ট ঘরের রক্ষণাবেক্ষনের খরচ	২০০০.০০
২	গোবর এবং কৃষিজ বর্জ্য ২০ টন @ ১০০০ টাকা / টন	২০০০০.০০
৩	৩ জন শ্রমিক @ ২০০ টাকা / ২ মাসের জন্য	৩৬০০০.০০
৪	জলের খরচ	১০০০.০০
৫	প্যাকেজিং এবং পরিবহনের খরচ @ ৪০০ টাকা / টন	৫০০০.০০
	মোট খরচ	৬৪০০০.০০

দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রতি তিনমাস অন্তর আয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়
১	কেঁচো ৫০ কেজি / ৬০০ টাকা / কেজি	৩০০০০.০০
২	ভার্মিকম্পোষ্ট সার ১২.৫ টন @ ১০০০০ টাকা / টন	১২৫০০০.০০
	মোট আয়	১৫৫০০০.০০

লাভ = মোট আয় - মোট খরচ ১৫৫০০০.০০ - ৬৪০০০.০০
= ৯১০০০.০০ টাকা অর্থাৎ ৩০৩০০ টাকা প্রতি মাসে।

সুতরাং সংরক্ষণ কৃষিতে ভার্মিকম্পোষ্ট উৎপাদনের মাধ্যমে সহজেই উপার্জন করা যায়। যা উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে আয় ও বৃদ্ধি পায়। ভার্মিকম্পোষ্ট উৎপাদনে লিগুউমস এবং জৈব সার মিশ্রনের মাধ্যমে ভার্মিকম্পোষ্টের গুণমান বৃদ্ধি পায় যা বেশি দামে বিক্রি করা যায়।

৩.০ গুণগতমান বৃদ্ধি করা বা সমৃদ্ধশালী জৈবসার প্রস্তুতি ও ব্যবহার ঃ
(Enriched compost production & Use) :

জৈব সার প্রধাণত জৈব উৎস থেকে উৎপাদন করা হয়। যেখানে সাধারণত পশুর বিষ্ঠা এবং শাক সব্জির খোসা এছাড়া কৃষিক অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করা হয়। যে সার জমির উর্বরতা বাড়ায়, মাটির মধ্যে বায়ু এবং জল সঞ্চালন বৃদ্ধি করে তাকে জৈব সার বলে। উদাহরণ ঃ খামারজাত সার, কম্পোষ্ট সার, পোলট্রি সার, কেঁচোজাত সার ইত্যাদি।

৩.১ জৈব সার ব্যবহারের কারণ ঃ

১। জৈব সার মাটিতে জৈব উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায়।
২। জৈব সার মাটির অজৈব উপাদানগুলি ভেঙ্গে জৈব উপাদানে পরিণত করে, যা সহজে গাছ শোষণ করতে পারে।
৩। মাটির মধ্যে বায়ু এবং জল সঞ্চালন বৃদ্ধি করে।
৪। জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে।

৩.২ জৈব সারের উৎস ঃ

* গবাদি পশুর গোবর, মুত্র ইত্যাদি।
* কৃষিজাত বর্জ্য যেমন ফসলের অবশিষ্টাংশ, ফলমূলের খোসা, ঘাস, লতাপাতা, ধান, গমের খড়, শষ্যের ভূঁষি।
* গৃহস্থালির আবর্জনা, পোলট্রির আবর্জনা, আগাছা, কচুরিপনা, বিভিন্ন শিম্ব গোত্রীয় গাছের পাতা, সজনে পাতা, সুবাবুল ইত্যাদি।

৩.৩ প্রথাগত জৈব সারের ব্যবহার অসুবিধা ঃ

১। প্রথাগত জৈব সার খুব অল্প পরিমাণে উদ্ভিদের পরিপোষক পদার্থ মাটিতে সরবরাহ করে।
২। এই সার প্রয়োগের সময় নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাস সরবরাহ নাও করতে পারে।
৩। অনেক বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয় বহন করা কষ্ট সাপেক্ষ।

৩.৪ জীবাণু সার (Bio-fertilizer)

প্রকৃতিতে কিছু উপকারী জীবাণু আছে যারা বাতাসের নাইট্রোজেনকে শিকড়ের অর্বুদে আবদ্ধ করে গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে অথবা মাটির অদ্রাব্য ফসফেটকে দ্রবীভূত করে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, অর্থাৎ জমির উর্বরতা বাড়ায়। পরীক্ষাগারে বিশেষ উপায়ে এইসব জীবণু কালচার (culture) করা হয়। কালচার করা এইসব জীবাণু জমিতে প্রয়োগ করা হলে এদের জীবাণুসার বলা হয়। প্রতি গ্রাম কালচারের সঙ্গে পাঁক বা কাঠ-কয়লার গুঁড়ো ইত্যাদি ১:৩ অনুপাতে মিশিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে প্যাকেট করা হয়, এরকম প্রতিটি প্যাকেটের ওজন হয় প্রায় ২০০ গ্রাম। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে জীবাণুর নাম, পরিমাণ, কোন কোন ফসলে ব্যবহার করা যাবে, প্রয়োগ পদ্ধতি ও কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে সেই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া থাকে।

প্রকৃতিতে বহুহু সংখ্যক উপকারী জীবাণু পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মূলতঃ তৈরি করা হয় রাইজোবিয়াম, অ্যাজেটোব্যাকটার, অ্যাজোস্পাইরিলাম ও ব্যাসিলাস ফার্মাস এই চারটি জীবাণুকে। নিচে কোন জীবাণু কোন ফসলে ব্যবহার করা যাবে তা সারণীর মাধ্যমে দেখানো হল।

জীবাণু সার	প্রকৃতি	ফসল
১। রাইজোবিয়াম লেগুমিনোসারাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	মটর, মসুর, খেসারি
২। রাইজোবিয়াম জাপোনিকাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	সয়াবীন।
৩। রাইজোবিয়াম প্রজাতি	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	মুগ, ছোলা, অড়হর, কলাই বরবটি ইত্যাদি।
৪। অ্যাজেটোব্যাকটার	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	পাট, আলু, আখ, সর্ষে, ভুট্টা, গম, তুলো, সূর্যমুখী, ফুল, সকল প্রকার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীনি সব্জি।
৫। অ্যাজোস্পাইরিলাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, আলু, সর্ষে ও সকল প্রকার সব্জি।
৬। ব্যাসিলাস ফার্মাস	ফসফেট দ্রবণকারী	সমস্ত রকম তন্তুল জাতীয় শস্য, ডাসশস্য, তৈলবীজ ও সকল প্রকার সব্জি।

৩.৫ জীবাণু সার কী?

জীবাণু সার হল এক বা একাধিক জীবাণুর মিশ্রণ যা উফযুক্ত পরিবেশ বা ছায়ায় রেখে কম পরিমাণে ফসলে প্রয়োগ করা হয়, এরা মাটির উর্বরতা শক্তিকে বাড়ায় এবং ফসলে উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখে।

৩.৬ জীবাণু সারের শ্রেণীবিভাগ (Types of Bio-fertilizer)

জীবাণু সারকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা -

(ক) নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুসার।

(খ) ফসফেট / পটাশ দ্রবীভূতকারী জীবাণুসার।

(গ) জৈব পদার্থ পচনে সাহায্যকারী জীবাণুসার।

৩.৭ নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু সার (Nitrogen fixing bio-fertilizer)

প্রতি বছর যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার বিভিন্ন কলকারখানায় উৎপাদন হয় তার প্রায় চারগুণ নাইট্রোজেন বিভিন্ন দ্বারা মাটিতে আবদ্ধ হয়।

নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুসার দুই প্রকারের। যেমন -

(১) মিথোজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু।

(২) মুক্তজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু।

৩.৭ (ক) মিথোজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু (Symbiotic N_2 fixing bacteria)

রাইবোজিয়াম গোত্রীয় ব্যাকটিরিয়া শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ যেমন - ছোলা, মুসুর ও সমস্ত ডাল জাতীয় ফসল এবং বাদাম, সয়াবীন প্রভৃতি ফসলের শিকড়ে অর্বুদ তৈরি করে বাস করে। বাতাসের নাইট্রোজেনকে ঐ সমস্ত গাছের শিকড়ে আবদ্ধ করে গাছকে নাইট্রোজেন যোগান দেয় তার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ে। অনুকূল পরিবেশে রাইজোবিয়াম গোত্রীয় ব্যাকটিরিয়া একর প্রতি ১৬-৮০ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যুক্ত করে। মিশ্রণ তৈরি হলে ঐ মিশ্রণ ছায়াযুক্ত জায়গার এক একর জমিতে বোনার মতো প্রয়োজনীয় বীজে ভালোভাবে মাখাতে হবে এবং ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে জমিতে বুনতে হবে।

ছত্রাকনাশকের সাহায্যে বীজ শোধন করলে জীবাণুর উপর তার কুপ্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে জীবাণুর পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। প্রথমে ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করার পর বীজের সঙ্গে জীবাণু সার মেশাতে হবে।

অম্লমাটিতে ৪০০ গ্রাম জীবাণুর সার ২ কেজি গুঁড়ো চুণ রাইজোবিয়াম মিশ্রিত বীজের সঙ্গে বীজ ভিজে থাকাকালীন মিশিয়ে জমিতে বুনলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিশেষ প্রজাতির রাইজোবিয়াম বিশেষ ধরনের ডালশস্যের শিকড়ে অর্বুদ তৈরি করে নাইট্রোজেন জমা করতে পারে। বীজ শোধনের আগে সঠিক প্রজাতির জীবাণু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

৩.৭ (খ) মুক্তজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু (Free-living N_2-fixing bacteria) মাটিতে স্বাধীনভাবে বসবাসকারী বেশ কিছু ব্যাকটিরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মাটিতে আবদ্ধ করতে পারে। সেই সব ব্যাকটিরিয়া গুলি হ'ল অ্যাজোটোব্যাক্টর (Azotobactor), অ্যাজোমোনাস (Azomonas), বেইজেরিনাকিয়া (Beijerincia), ডাসরিয়া (Derxia), মাইকোব্যাকটিরাম (Mycobacterium), অ্যাজোস্পাইরিলাম (Azospirillium), অ্যাসিটোব্যাক্টর (Acetabactor), ব্যাসিলাস (Bacillus), এন্টারোব্যাক্টর (Enterobactor), ইসচেরিয়া (Escherchia), ক্লেসিল্লা (Klebsiella), রোডো সিউডোমোনাস (Rhodo pseudomonas), রেডো স্পিরিলাম (Rhodo spirillum), ক্লাসট্রিডিয়াম (Clostidium), ক্লোরোবিয়াম (Cholorobium), ক্রোমোটিয়াম (Cromatium) প্রভৃতি। এর মধ্যে অ্যাজোটোব্যাক্টর, অ্যাসিটোব্যাক্টর এবং অ্যাজোস্পাইরিলামের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার ক্ষমতা বেশি থাকায় জীবাণু সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (Enterobactor), ইসচেরিয়া (Escherchia), ক্লেসিল্লা (Klebsiella), রোডো সিউডোমোনাস (Rhodo pseudomonas), রেডো স্পিরিলাম (Rhodo spirillum), ক্লাসট্রিডিয়াম (Clostidium), ক্লোরোবিয়াম (Cholorobium), ক্রোমোটিয়াম (Cromatium) প্রভৃতি। এর মধ্যে অ্যাজোটোব্যাক্টর, অ্যাসিটোব্যাক্টর এবং অ্যাজোস্পাইরিলামের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার ক্ষমতা বেশি থাকায় জীবাণু সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাজোটোব্যাক্টর (Azotobactor) অ্যাজোটোব্যাক্টরের প্রজাতিগুলির মধ্যে অ্যাজোটোব্যাক্টর ক্রোরোকুক্কাম এখানকার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। এরা গাছের শিকড়ের কাছাকাছি বসবাস করে এবং বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে গাছকে সরবরাহ করে। সাধারণত বছরে একর প্রতি ৮-১২ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যোগান দেয়। অ্যাজোটোব্যাক্টর গাছের বৃদ্ধিবর্ধক পদার্থ যেমন - থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ইন্ডোল, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, নিকোটিনিক এবং জিব্রালিন অ্যাসিড প্রস্তুত করে থাকে। এরা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে খুবই উপযোগী হয় এবং গাছকে রোগমুক্ত করতে সাহায্য করে।

অ্যাজোটোব্যাক্টরের কার্যকারিতা নিরপেক্ষ পি.এইচ (pH) যুক্ত মাটিতে ভালো হয়। পি.এইচ (pH) ৫.৫ এর নিচে অথবা ৮.৫ এর উপর গেলে কার্যকারিতা লোপ পায়। ২০° ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এবং স্যাঁতসেতে জায়গায় অ্যাজোটোব্যাক্টর ভালোভাবে কাজ করে। জমিতে জল জমে থাকলে বা তাপমাত্রা ৩৮° ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর হলে কার্যকারিতা খুবই কমে যায়। ধান, গম, ভুট্টা, সব্জি, পাট, ডাল এবং তৈল জাতীয় ফসলে অ্যাজোটোব্যাক্টর প্রয়োগ করা হয়। বেলে দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি এবং বায়ু চলাচলে সক্ষম শুকনো মাটিতে অ্যাজোটোব্যাক্টর ব্যবহারের সুফল পাওয়া যায়।

অ্যাজোস্পাইরিলাম (Azospirillum)

অ্যাজোস্পাইরিলামের তিনটি প্রজাতির মধ্যে অ্যাজোস্পাইরিলাম ব্রাসিলেন্স অ্যাজোস্পাইরিলাম নিপোফেরাম প্রকৃতিতে বেশি পাওয়া যায় তা কৃষিক্ষেত্রে জীবাণু সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরা গাছের শিঁকড়ের পাশে থাকে এবং বাতাস থেকে নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ করে। অ্যাজোস্পাইরিলাম ভিটামিন এবং গাছের বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ তৈরি করে। অধিক পরিমাণ খামারজাত সার মিশ্রিত পি.এইচ. নিরপেক্ষ (neutral pH) মাটি অ্যাজোস্পাইরিলামের কার্যকারিতার পক্ষে অনুকুল। তবে অম্ল মাটিতেও অ্যাজোস্পাইরিলাম কাজ করতে পারে। সাধারণত ৩২ থেকে ৪০ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এর পক্ষে আদর্শ। কিন্তু তাপমাত্রা ১৮° ডিগ্রির নিচে নেমে গেলে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণের কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

সাধারণত এঁটেল বা এঁটেল দোআঁশযুক্ত ভারি মাটি যেখানে বায়ু চলাচল করা ভালো। ধানের জমিতে অ্যাজোস্পাইরিলাম প্রয়োগ সুফল পাওয়া যায়।

৩.৮ জীবাণু সারের প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ অ্যাজোটোব্যাক্টর এবং অ্যাজোস্পাইরিলাম বিভিন্নভাবে ফসলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন -

বীজশোধন পদ্ধতি ঃ প্রতি কেজি বীজের জন্য ২০ গ্রাম জীবাণুসার, ৪০ মিলি জলের সঙ্গে মিশিয়েই প্রস্তুত করা হয়। তারপর ঐ মিশ্রণে বীজ মাখিয়ে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকানো প্রয়োজন।

আদা, হলুদ প্রভৃতির শোধন পদ্ধতি ঃ

বীজের আয়তন অনুসারে ২০-২৫ লিটার জলে ১ কেজি জীবাণু মিশাতে হবে। তারপর ঐ মিশ্রনে ১ একর জমির বীজ ২৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে লাগাতে হবে।

চারাশোধন পদ্ধতি ঃ বীজতলায় যে সমস্ত ফসলের চারা তৈরি করে মূল জমিতে লাগাতে হয় তার জন্য চারা তোলার পর বান্ডিল বেঁধে শিঁকড়গুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া দরকার। এরপর ১ কেজি জীবাণু সার ৫-১৫ লিটার জলে মিশিয়ে এক একর জমির প্রয়োজনীয় চারা ঐ মিশ্রনে ২৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে চারা মূল জমিতে বসাতে হবে।

ধানের ক্ষেত্রে ২ বর্গমিটার জায়গায় ১ কেজি জীবাণু সার জমিতে জলের সঙ্গে মিশিয়ে একর প্রতি জমির প্রয়োজনীয় চারা ৮-১২ ঘন্টা মিশ্রণে রাখা দরকার।

জমিতে প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ ২ কেজি জীবাণু সার ৫০-১০০ কেজি জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে সেচ দেওয়ার আগে জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

আলু এবং আখের ক্ষেত্রে মাটি দেওয়ার সময় জমিতে প্রয়োগ করা হয়। ফল এবং বনজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ২৫ গ্রাম জীবাণু সার ৫০০ গ্রাম জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা হয়।

জীবাণু সার সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা যায় অথবা বীজে বা শিঁকড়ে প্রয়োগ করা যায়। খেয়াল রাখা দরকার যে, একই ফসলে কমপক্ষে দুটি পদ্ধতিতে জীবাণু সার প্রয়োগ করলে বেশি ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে জীবাণু সার প্রয়োগের সঙ্গে রাসায়ণিক সারও জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৩.৯ জীবাণু সার ব্যবহারের উপযোগিতা (Advantages of biofertilizer)

(১) নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুরা সাধারণত হেক্টর প্রতি ৬-১২ কেজি নাইট্রোজেন এবং ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুগুলি হেক্টর প্রতি ৫-৬ কেজি ফসফেট উদ্ভিদকে দিতে পারে।

(২) জৈব পদার্থ যোগ করে মাটির গঠন ও উর্বরতা বাড়ায়।

(৩) গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) পরিবেশ দূষণের পরিমাণ কমে, খরচের সাশ্রয় হয়।

(৫) ফসলের ফলন প্রায় ১০-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

৪.০ জীবাণু সার প্রয়োগের সতর্কতা (Precautions)

(১) জীবাণু সারের সঙ্গে জৈব সারও অবশ্যই প্রয়োগ করা দরকার।

(২) জীবাণু সার মেশানোর অন্তত ২৪ ঘন্টা আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে এবং মেশানোর পর আর কোন রোগনাশক বা কীটনাশক মেশানো চলবে না।

(৩) জীবাণু সার প্রয়োগের এক সপ্তাহ আগে ও পরে অথবা জীবাণু সারের সঙ্গে অন্য সার, কীটনাশক, রোগনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) জীবাণু সারের প্যাকেট কখনোই রোদে রাখা উচিত নয়।

(৫) মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই প্যাকেটের জীবাণু সার ব্যবহার করে ফেলতে হবে।

(৬) নির্দিষ্ট ফসলের জন্য নির্দিষ্ট জীবাণুসার ব্যবহার করতে হবে।

৪.১ ফসফেট / পটাস দ্রবীভূতকারী জীবাণুসার

মাটিতে আবদ্ধ ফসফরাস এবং পটাশিয়ামকে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কিছু কিছু জীবাণু বা অনুজীবী সাহায্য করে। অদ্রাব্য বা আবদ্ধ ফসফরাস বা পটাশিয়ামের ফলে দ্রাব্য, সরল এবং গ্রহণযোগ্য রূপে চলে আসে। সিউডোমোনাস (Pseudomonas), ব্যাসিলাস (Bacillus), পেনিসিলিয়াম (Penicillium), অ্যাস্পারজিলাস (Aspergillus) ইত্যাদি বহু অণুজীবী এই কাজে সাহায্য করে। এরা কিছু জৈব অ্যাসিড প্রস্তুত করে যারা মাটিতে আবদ্ধ বা অদ্রাব্য P এবং K - কে মুক্ত করে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও সহজলভ্য করে তোলে।

৪.২ গুণগতমান বৃদ্ধি করা জৈব সার বা সমৃদ্ধশালী জৈব সার ঃ

প্রথাগত জৈব সারের সাথে জীবাণু সার এবং রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু মিশ্রণের মাধ্যমে জৈব সারকে উৎকৃষ্ট মানের করা হয়, ঐ সারকে সমৃদ্ধশালী জৈব সার বলে।

সাধারণত প্রথাগত জৈব সার যেমন খামারজাত সার, কেম্পোষ্ট সার, পোলট্রি সার, কেঁচোজাত সারের সাথে জীবাণু সার (অ্যাজোটোব্যাক্টর, ফসফোব্যাক্টর, ভ্যাম এবং রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু (ট্রাইকোডারমা, ফ্লুরোসেন্ট, ফসফোব্যাক্টর, ভ্যাম ইত্যাদির ব্যবহার করে জৈব সারকে সমৃদ্ধশালী করা যায়, গুণগত মান বৃদ্ধি করা যায়)।

৪.৩ জৈব কৃষিতে জীবাণু সারের উপযোগিতা ও প্রয়োগবিধি ঃ

জৈব সার	জীবাণু সারের নাম	ফসল	প্রয়োগবিধি
খামারজাত সার, কম্পোষ্ট সার, পোলট্রি সার, কেঁচোজাত সার।	১. নাইট্রোজেন সরবরাহকারী ব্যাকটেরিয়া ক. অ্যাজোটোব্যাক্টর ক্রুককাম অ্যাজোটোব্যাক্টর বেইজিরিঞ্চি - ৫ গ্রাম প্রতি কেজি জৈব সার।	১. বাগিচা জাতীয় ফসল (সব্জি, ফুল, ফল) গম, তৈল ফসল, চা, তামাক, পাট, আলু, নারিকেল, সুপারী, পান।	এক টন অর্ধপচনশীল জৈব সারের সাথে জীবাণু ৫ কজি মিশ্রিত করে ৩ সপ্তাহ ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে হাল্কা জলে ছিঁটে দিয়ে রাখতে হবে, ভিজে কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং ৭ দিন পর দেখতে হবে। সাতদিন পরে স্তুপটিকে নাড়াচাড়া করে ০.৩ শতাংশ বোরণ স্প্রে করে উপর দিয়ে খড় চাপা দিয়ে আরও ৭ দিন রাখতে হবে। এর পর ঐ জীবাণু সমৃদ্ধ সার ৫ কাঠা মূল জমিতে শেষ চাষের আগে মিশিয়ে দিন।
খামারজাত সার, কম্পোষ্ট সার, পোলট্রি সার, কেঁচোজাত সার।	২. ফসফরাস দ্রবণকারী ব্যাকটেরিয়াঃ ব্যাসিলাস মেগাটিরিয়াম, সিউডোমোনাস স্ট্রিয়াটা ৫ গ্রাম প্রতি কেজি জৈব সার। ৩. আরবাসকুলার মাইকোরাইজা ঃ গ্লোমাস, গিগাস্পোরা।	২. ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলে ব্যবহার করা হয়। ৩. ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, সুপারি ফসলে ব্যবহার করা হয়।	এক টন অর্ধপচনশীল জৈব সারের সাথে জীবাণু ৫ কজি মিশ্রিত করে ৩ সপ্তাহ ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে হাল্কা জলে ছিঁটে দিয়ে রাখতে হবে, ভিজে কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং ৭ দিন পর দেখতে হবে। সাতদিন পরে স্তুপটিকে নাড়াচাড়া করে ০.৩ শতাংশ বোরণ স্প্রে করে উপর দিয়ে খড় চাপা দিয়ে আরও ৭ দিন রাখতে হবে। এর পর ঐ জীবাণু সমৃদ্ধ সার ৫ কাঠা মূল জমিতে শেষ চাষের আগে মিশিয়ে দিন। যে সব ফসলের ক্ষেত্রে গাছের দূরত্ব বেশী সেখানে চারা রোপণের জায়গায় ছোট গর্ত করে ১০ গ্রাম জীবাণু সমৃদ্ধ সার মাটির সঙ্গে মেশাবার পর চারা রোপণ করতে হবে।

৪.৪ জৈব কৃষিতে রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু সারের উপরোগিতা ও প্রয়োগবিধি ঃ

জৈব সার	রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু সারের নাম	ফসল	প্রয়োগবিধি
খামারজাত সার, কম্পোষ্ট সার, পোলট্রি সার, কেঁচোজাত সার।	জৈব সারের সঙ্গে রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু ১. ট্রাইকোডারমা	১. সব ধরনের ফসলের রোগ প্রতিরোধ করে। ফুলকপি, তুলা, সয়াবিন, আখ, গাজর, বেগুন, আলু, পেঁয়াজ, বাদাম, চা, তামাক, পাট, আলু, নারিকেল, সুপারি, পান, ধান, গম, ভুট্টা, আদা, হলুদ প্রভৃতি ফসলের রোগ প্রতিরোধ করে।	প্রতি কেজি সারের সঙ্গে (কেঁচো সার / কম্পোষ্ট সার / খামারজাত সার) - ৫ গ্রাম জীবাণু পাউডার ভালো করে মিশিয়ে ভিজে কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং ৭ দিন পর দেখতে হবে। তারপর জমিতে বিঘা প্রতি ২.৫-৩.০ ক্যুইন্টাল সমৃদ্ধশালী জৈব সার প্রয়োগ করা হয়। যে সব ফসলের ক্ষেত্রে গাছের দূরত্ব বেশী সেখানে চারা রোপণের জায়গায় ছোট গর্ত করে ১০ গ্রাম জীবাণু সমৃদ্ধ সার মাটির সঙ্গে মেশাবার পর চারা রোপণ করতে হবে।
খামারজাত সার, কম্পোষ্ট সার, পোলট্রি সার, কেঁচোজাত সার।	জৈব সারের সঙ্গে রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু - ২. ফ্লুরোসেন্ট সিউডোমোনাস	২. বেগুন, আলু, পেঁয়াজ, বাদাম, চা, তামাক, পাট, আলু প্রভৃতি ফসলের রোগ প্রতিরোধ করে।	প্রতি কেজি সারের সঙ্গে (কেঁচো সার / কম্পোষ্ট সার / খামারজাত সার) - ৫ গ্রাম জীবাণু পাউডার ভালো করে মিশিয়ে ভিজে কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং ৭ দিন পর দেখতে হবে। তারপর জমিতে বিঘা প্রতি ২.৫-৩.০ ক্যুইন্টাল সমৃদ্ধশালী জৈব সার প্রয়োগ করা হয়। যে সব ফসলের ক্ষেত্রে গাছের দূরত্ব বেশী সেখানে চারা রোপণের জায়গায় ছোট গর্ত করে ১০ গ্রাম জীবাণু সমৃদ্ধ সার মাটির সঙ্গে মেশাবার পর চারা রোপণ করতে হবে।

৪.৫ রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণুর ব্যবহার দ্বারা নিম্নলিখিত রোগ ও জীবাণু দমন করা হয়

১.ট্রাইকোডারমা ঃ

Pythium sp., Phytopthora sp., Macrophomina phaseolina (dry rot), charcoal rot, loose smut, karnal bunt, black scurf, foot rots or pepper, betelvine, Sclerotia forming pathogens et

১. ফ্লুরোসেন্ট সিউডোমোনাস ঃ

Pythium sp., Phytopthora sp., Rhizoctonia, Fusarium sp. Rice diseases (sheath blight, blast), cabbage, cauliflower (club root), Mango disease like anthracnose and others.